BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04040026

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 04 | April 2026 | e-ISSN: 2584-1890

রঙ্গমঞ্চ ও দর্শক : সম্পর্কের সমীকরণ

টুম্পা ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বালুরঘাট কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ

সংক্ষিপ্তসার: *নাট্যকার যে নাটক লেখেন তা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়। সেদিক থেকে নাটক সাহিত্যের অন্যান্য ধারার থেকে স্বতন্ত্র। নাটক আসলে মঞ্চ, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, মঞ্চানুষঙ্গিক এবং নাট্যানুষঙ্গিক যাবতীয় উপকরণ-দর্শক-এই সমস্ত মিলিয়ে এক যৌগ রসায়ন। প্রাচীন ভারতবর্ষে নাট্যচর্চা ও অভিনয়কলা রাজা, অভিজাত, ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকে অবক্ষয় নেমে আসে। এছাড়া মুসলমান আক্রমণে হিন্দু রাজত্বের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালাগুলিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে রচনা স্রোত হারিয়ে প্রচলিত লোকনাট্যের ধারার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিল। পরে চৈতন্যদেব ভক্তি আন্দোলনের প্রচার মাধ্যম হিসাবে নৃত্য-গীত সমন্বিত কৃষ্ণলীলাভিনয়কে অবলম্বন করেছিলেন। তখন দেশীয় মানুষ কবিগান-তর্জা-যাত্রা-কথকতা শুনতেই অভ্যস্ত ছিল। পরে ইংরেজদের থিয়েটার দেশীয় বাবুশ্রেণির মনে এক মঞ্চ তৈরির বাসনার জন্ম দেয়। সে বাসনাকে আমরা বাস্তবায়িত হতে দেখি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। পরে এই শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে বাঙালি বাবুদের বাড়ির আঙ্গিনায় পাশ্চাত্য থিয়েটারের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের এই মঞ্চে প্রবেশের কোনো অধিকার ছিল না। দর্শকরা সকলেই ছিলেন বাবুশ্রেণির আমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন-বান্ধব। বিনোদনই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরে ধনী ব্যবসায়ীরা মঞ্চ কিনে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন করতে চাইলে মঞ্চ সেদিন পুরোপুরি পেশাদারী মঞ্চের রূপ পরিগ্রহ করে। এভাবেই এখানে আলোচনা করা হয়েছে মঞ্চ ও দর্শকের সম্পর্কের সমীকরণ।*

মূলশব্দ: *রঙ্গমঞ্চ, দর্শক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাটক, থিয়েট্রিকাল ভ্যালু, রেস্টোরেশন যুগ, ড্রামাটিস্ট, প্লেরাইট।*

মূল আলোচনা:

নাট্যকার যে নাটক লেখেন তা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ অভিনীত নাটক দর্শনের মধ্য দিয়ে দর্শক নাটকের রস, আনন্দ উপভোগ করেন। সেদিক থেকে নাটক সাহিত্যের অন্যান্য ধারার থেকে স্বতন্ত্র। নাটক আসলে মঞ্চ, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, মঞ্চানুষঙ্গিক এবং নাট্যানুষঙ্গিক যাবতীয় উপকরণ-দর্শক-এই সমস্ত মিলিয়ে এক যৌগ রসায়ন।

নাটক রচনা করার সময় নাট্যকারকে কিছু বিধিবদ্ধতা মানতেই হয়। নাটক মানুষ দুইভাবে উপভোগ করে। এক- প্রত্যক্ষ পাঠ, দুই- মঞ্চে নাটকের অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ। এ কারণে পণ্ডিতেরা নাটকের তত্ত্বগতদিক এবং মঞ্চগতদিক- এই দুই দিকের আলোচনা করেন। যদিও সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে নাটকের লিটারারি ভ্যালু অপেক্ষা থিয়েট্রিকাল ভ্যালু অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নাটক যেভাবে দেশের সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রকাশ করে, প্রভাবিত করে শিল্পের অন্য মাধ্যম তার ধারে কাছেও যায় না।

রেস্টোরেশন যুগে নাট্যকাররা নাটকের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ড্রামাটিস্ট ও প্লেরাইট এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। মঞ্চে অভিনীত হওয়ার বাসনায় প্লেরাইটরা ক্রমে মঞ্চসেবীতে পরিণত হন- নাটক রচনা করতে গিয়ে তাদের মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পারঙ্গমতা, মঞ্চে নাটকের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান (মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি) দর্শকের চাহিদা সর্বোপরি মালিকের আর্থিক সাফল্যের দিকে নজর রাখতে হলো। কিন্তু প্লেরাইট কেন ড্রামাটিস্টদের পক্ষেও পরোক্ষে হলেও সমকালীন দর্শকদের রুচি-চাহিদাকে গুরুত্ব দিতেই হয়। কারণ মানুষকে বর্জন করে কোনো শিল্পই জন্ম নিতে বা বেঁচে থাকতে পারে না। সে কারণে যুগে যুগে বিবেকী নাট্যকার মঞ্চব্যবস্থা, রঙ্গালয়ের সঙ্গে দর্শকের সম্পর্কের প্রকৃতি, দেশ-কাল-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট, সামাজিক মানুষের অন্তঃশায়ী কামনা-আবেগ, মানুষের সামাজিক চেতনা, জাতির ইতিহাসের জাগরণের প্রেক্ষিতকে অনুধাবন করে নাটক রচনা করেন। মঞ্চ লোকশিক্ষা প্রদানের বাহন হয়ে ওঠে। মঞ্চ ও দর্শকের মধ্যে স্থাপিত হয় এক অনবদ্য সম্পর্ক।

প্রাচীন ভারতবর্ষে নাট্যচর্চা ও অভিনয়কলা রাজা, অভিজাত, ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজপ্রাসাদে নাটক অভিনয়ের জন্য স্বতন্ত্র সঙ্গীতশালা নামে হলঘরও থাকত। সাধারণ মানুষের এই স্থানে প্রবেশের ও অভিনয় দর্শনের কোনো অধিকার ছিল না। রাজা এবং আমন্ত্রিত দর্শকই ছিলেন অভিনয় দর্শনের অধিকারী। সাধারণ মানুষের বিনোদন- সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে লোকনাট্য প্রচলিত ছিল সমাজে। লোকনাট্য তাদের নাট্যক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকে অবক্ষয় নেমে আসে। আর প্রায় সমসময়ে বিধর্মী মুসলমান আক্রমণে হিন্দু রাজত্বের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালাগুলিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলত এই সময় সংস্কৃত নাটক তার মূল রচনা স্রোত হারিয়ে প্রচলিত লোকনাট্যের ধারার সঙ্গে এসে মেশে।

“সংস্কত ভাষা ও নাট্য-আঙ্গিকের বন্ধন কাটিয়ে নাট্যচর্চা ক্রমশ দেশজ রূপ ধারণ করতে থাকে। এই জাতীয় নাট্যরূপে প্রধান হয়ে ওঠে সঙ্গীত। ইত্যাকার নাট্যরূপের প্রধান বিষয় ছিল: কৃষ্ণকথা বা রামলীলা।”[১]

নাটক একসঙ্গে বহু মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে বলেই চৈতন্যদেব ভক্তি আন্দোলনের প্রচার মাধ্যম হিসাবে নৃত্য-গীত সমন্বিত কৃষ্ণলীলাভিনয়কে অবলম্বন করেছিলেন। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণলীলাভিনয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।[২] বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য চৈতন্যদেব যে খোলা মঞ্চ ব্যবহার করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

আধুনিক অর্থে বাঙালি যাকে নাটক বা থিয়েটার হিসেবে মনে করেছে সেই নাট্যবোধ গড়ে উঠেছিল মূলত কলকাতায় ইংরেজদের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা বিদেশী রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অভিঘাতে, পাঠ্য বিষয় হিসাবে বিদেশী নাটক পাঠ করে।[৩] কলোনি ভারতবর্ষে ইংরেজদের থিয়েটার গড়ে ওঠে মূলত ইউরোপীয় থিয়েটারের অনুকরণে। ইংরেজদের ওল্ড প্লে হাউস বা প্লে হাউস পলাশীর যুদ্ধের এক বছর আগে ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে দি নিউ প্লে হাউস গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্য নির্মাতা ডেভিড গ্যারিকের অনুপ্রেরণায় কলকাতার প্রথম দুটি ইংরেজি রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ জুড়ে ইংরেজরা এদেশে একাধিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালি উচ্চবিত্ত সমাজের শীর্ষস্থানীয় মানুষরা বিদেশীদের এইসব থিয়েটারে যেতেন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে নাটক দর্শন আমাদের দেশীয় মানুষের কাছে একেবারেই আনকরা নতুন বিষয় ছিল। এতদিন পর্যন্ত দেশীয় মানুষ কবিগান-তর্জা-যাত্রা-কথকতা শুনতেই অভ্যস্ত ছিল। ইংরেজদের এই থিয়েটার দেশীয় বাবুশ্রেণির মনে অনুরূপ মঞ্চ তৈরির বাসনার জন্ম দেয়। সে বাসনাকে আমরা বাস্তবায়িত হতে দেখি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে।

দেশীয় ধনাঢ্যদের মঞ্চ গড়ে তোলার আগেই আর একজন বিদেশী অবশ্য কলকাতায় ইংরেজ ও বাঙালি উভয় শ্রেণির মানুষদের কথা মনে রেখে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি রুশ দেশীয় গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ। তিনি রিচার্ড পল জোড্রেল রচিত ‘দি ডিসগাইস’ এবং মলিয়েরের ‘লাভ ইজ দ্যা বেস্ট ডক্টর’ নাটক দুটির বাংলায় অনুবাদ করেন। ‘দি ডিসগাইস’ লিয়েবেডেফ প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলি থিয়েটারে অভিনীত হয়।

লেবেদেফ মূলত বাঙালি দর্শকদের কথা মাথায় রেখে নাটক রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি যাত্রা-খেউড়-পাঁচালি-ঢপ-কীর্তন ইত্যাদি নিম্ন রুচির আমোদ-প্রমোদে আসক্ত ছিল। বাঙালির এই মানস প্রবণতাকে লক্ষ্য করে তিনি হাস্যরসাত্মক লঘু কমেডি নাটকের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেন। এমন কি বাঙালির রুচিসম্মত হবে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি বাঙালি মুন্সী পন্ডিতদের নাটকটি দেখিয়েও নিয়েছিলেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর ‘দি ডিসগাইস’-এর বাংলা অনুবাদ ‘কাল্পনিক

সংবদল' মাত্র একটি অঙ্কে বাংলাতেই অভিনীত হয়। আর দ্বিতীয় রজনী ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ২১শে মার্চ তিন অঙ্কের পুরো নাটক অভিনীত হলেও দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য ইংরেজিতে এবং দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য মূর বা হিন্দুস্থানীয় ভাষায় অভিনীত হয়।

নাটক নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের পরিবেশন কৌশলেও বাঙালি রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে নাটকের চরিত্রগুলির নাম পরিবর্তন করে ভোলানাথ, সুখময়, রামসন্তোষ রাখেন। বাঙালির নাচ-গানের প্রতি আসক্তির কথা ভেবে সমাজে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনির– 'প্রাণ কেমন রে করে না দেখে তাহারে/ যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে' এবং 'গুণসাগরে নাগর রায়/ নগর দেখিয়া যায়' গান দুটি নিজ নাটকে সংযোজন করেন। নাটকে নাচের আয়োজনও ছিল। বলা বাহুল্য রঙ্গমঞ্চে বিপুল দর্শক সমাগম নাটকটির সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে। যদিও লেবেদেফের মঞ্চ বাঙালি জীবনে কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি।

লেবেদেফের পর দেশীয় মঞ্চচর্চার সূত্রপাত হয় আরও তিন দশক পরে। ততদিনে পাঠ্য বিষয় হিসাবে নাটক পড়ে এবং বিদেশীদের থিয়েটারে নাটক দেখে একশ্রেণির নব্য শিক্ষিত নাট্যবোদ্ধাও গড়ে উঠেছিল। ধনী গৃহে ইংরেজদের থিয়েটারের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশীয় রঙ্গমঞ্চ। আমোদ-প্রমোদের উপকরণ হিসাবে খ্যামটা নাচ, বাইনাচ, তরজা, কবিগান ইত্যাদি নাগরিক শ্রেণির কাছে কুরুচিকর, নিন্দনীয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিজ গৃহে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। নাটকের অভাবে ইংরেজি নাটকের অভিনয় বাঙালির মনঃপূত হয়নি। এরপরে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য-আখ্যানের বিদ্যাসুন্দর কাহিনিকে নিয়ে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু তার গৃহের আঙিনায় অভিনয়ের আয়োজন করেন।

নাটকের এই অনুবাদ করতে গিয়ে আক্ষরিক অনুবাদের সঙ্গে ভাবানুবাদ, রূপান্তর এবং ক্রমে মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়। উনিশ শতকের প্রায় মধ্যবর্তী সময়ে বাঙালির সামাজিক জীবনের নানা ব্যধি-কৌলিন্য প্রথা, জমিদারদের অত্যাচার, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি নানা ঘটনার ঘাত প্রবাহ দেখা গেল নাটকে। রচিত হলো- 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ', মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি নাটক-প্রহসন।

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে বাঙালি বাবুদের বাড়ির আঙ্গিনায় পুনরায় পাশ্চাত্য থিয়েটারের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের এই মঞ্চে প্রবেশের কোনো অধিকার ছিল না। দর্শকরা সকলেই ছিলেন বাবুশ্রেণির আমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন-বান্ধব। অভিনীত নাটক নির্বাচনে আমন্ত্রিত জনের রুচিই প্রাধান্য পেত। মঞ্চ সজ্জা থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোষাক, সাজসজ্জা সমস্তই চালিত হতো বাবু শ্রেণির ইচ্ছানুযায়ী। বিনোদনই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করলেও নিয়মিত অভিনয়ের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলকাতায় গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি থিয়েটারে অভিনীত নাটক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হল- আশুতোষদেবের বাড়ির থিয়েটার- কালীদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের বাংলা অনুবাদ, রামজয় বসাকের বাড়ির মঞ্চে রানারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে'র অভিনয়, কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে রানারায়ণ তর্করত্ন অনুদিত 'বেণীসংহার' নাটকের বাংলা অনুবাদ, কালিদাসের 'বিক্রমোবর্শীয়' নাটকের অনুবাদ, 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক। প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া মঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ, মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরীয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমন ফল', 'মালতী মাধব' ইত্যাদি নাটক। উল্লেখিত নাটক থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় মধ্যবিত্ত সমাজের যুগযন্ত্রণাকে এই তথাকথিত জমিদার সম্প্রদায় প্রায় পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়েছেন। অথচ সমাজ জীবনের বাস্তব সমস্যাকে উচ্চকিত করে এই পর্বে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে। এই সময়ের মঞ্চ মানসিকতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পুরোপুরি বাবু সমাজের মর্জি–মেজাজ অনুযায়ী—

"সখের নাট্যশালার যুগে নাটকও নাট্যশালার পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সৌখিন নাট্যশালাগুলিই নাট্যকার ও তার নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। কিন্তু এই নাট্যশালার ওপরে পৃষ্ঠপোষক ধনী ব্যক্তিদের নিজস্ব আধিপত্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত কাজ করেছে।"[৪]

নাটক নিয়ে বাবুসমাজের স্বেচ্ছাচারীতার পাশে যদিও নাটক ও মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা, তার শক্তি সম্বন্ধে সমাজের বেশ কিছু মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। সামাজিক ব্যাধির দূরীকরণ, সমাজ সংস্কার, সমাজের শুদ্ধিকরণের প্রয়োজনে বাবু সম্প্রদায় সমাজ সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটক রচনার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু নাটক রচিত

হলেও সে নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে কেন্দ্র করে রচিত মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি রাজারা মঞ্চস্থ করেননি। বেলগাছিয়া মঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে মধুসূদন দত্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি রচনা করেন। কিন্তু মধুসূদনের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও রাজারা নাটকটি মঞ্চস্থ করেননি। মধুসূদন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্মরণাপন্ন হন। কিন্তু পবিত্র হিন্দু বাড়িতে বিয়োগান্তক নাটকের অভিনয়ে মায়ের নিষেধাজ্ঞার কারণে 'কৃষ্ণকুমারী' পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত হয়নি। নাটক নিয়ে এই স্বেচ্ছাচারীতার কারণে মধুসূদন দত্ত বারবার জাতীয় নাট্যশালার অভাব অনুভব করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই বাসনা বাস্তবায়িত হয়েছে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজার আমেচার সম্প্রদায় ধনীর ছত্র-ছায়ার বাইরে স্বাধীন মঞ্চ প্রয়াসের স্বাক্ষর রেখেছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এরপর ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নাট্যশালা সখের থিয়েটার থেকে পাবলিক স্টেজে এসে পৌঁছায়। ১৮৫৭ থেকে ১৮৭২-এই কাল পর্বে বাবুদের বাড়ির আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে সাধারণের প্রবেশের কোনো অধিকার ছিল না। অথচ সাধারণ মানুষের মধ্যে নাট্য দর্শনের তৃষ্ণা বাড়তে থাকে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাধারণের জন্য মঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবী তার প্রমাণ।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বসাধারণের কাছে মঞ্চের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। মানুষ টিকিট কেটে নাটক দেখার সুযোগ পান। যুগোগত প্রভাবকে শিরোধার্য করে সেদিনের থিয়েটারের সঙ্গে রাজনীতির একটা প্রত্যক্ষ যোগ গড়ে ওঠে। স্বাদেশিকতা ও স্বাদেশিকতার আগুনে সেঁকা হাতে নাট্যকাররা যে সমস্ত নাটক লিখেছেন তাতে ইংরেজ শাসন-শোষণের নগ্ন চেহাড়া স্পষ্টীকৃত হয়ে যায় দর্শকের সামনে। সেদিন নাটক মঞ্চে জাতীয় মুক্তি বাসনা সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিল। শাসক ইংরেজদের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে অনিবার্য ভাবে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ওপর নেমে এসে ছিল নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন।

নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিক্রিয়ায় মঞ্চজগতে যে অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিত হয় তা পুনরায় শৃঙ্খলিত রূপে আত্মপ্রকাশ করে ধনী ব্যবসায়ীদের মালিকানায় এসে। টিকিট বিক্রির মধ্য দিয়ে জাতীয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে পেশার একটা যোগ গড়ে উঠলেও শুধুমাত্র মুনাফা লাভ আদর্শ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ধনী ব্যবসায়ীরা মঞ্চ কিনে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন করতে চাইলে মঞ্চ সেদিন পুরোপুরি পেশাদারী মঞ্চের রূপ পরিগ্রহ করে। দর্শক বৃদ্ধির জন্য মঞ্চ মালিকরা বেতনভুক নাট্যকারকে দর্শক তোষণকারী নাটক রচনার নির্দেশ দেন। পেশাদারীত্বের দায়ে দর্শক মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সেদিনের মঞ্চকে নানান সীমাবদ্ধতা ও স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সময় বাংলা মঞ্চ প্রায় পুরোপুরি দর্শকের বিনোদন উপভোগের সামগ্রী হয়ে ওঠে। নাট্যকাররা হয়েছেন মঞ্চবশ। ভক্তিপ্রাণ বাঙালির ধর্মের আসক্তিকে লক্ষ্য করে ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক, সংগীত রসপিপাসু বাঙালির সংগীত প্রিয়তার জন্য গীতি নাটক, অপেরা, স্থূল ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক রচনা করেন। পেশাদারীত্বের দায়ে নাট্যকাররা মঞ্চবশ্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে মঞ্চগ্রাহ্য নাটক রচনা করতে বাধ্য হন:

"গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য বেতনভোগী নাট্যকারদের ১৮৮১-র পর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নাটক, লিখতে হয়েছে। একটি আখ্যান (পুরাণ নির্ভর, ইতিহাস নির্ভর) ইত্যাদি জনপ্রিয় হল তো সেই একই ধরনের আখ্যানের অনুকরণে নাট্যকার নিজেই তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় নাটক লিখলেন, অন্যরাও সেই গড্ডালিকা স্রোতে যোগ দিল।"[৫]

প্রতিযোগিতার বাজারে দর্শক তোষণ করতে গিয়ে বাংলা মঞ্চ এই সময় পর্বে প্রায় পুরোপুরি দর্শক চাহিদা অনুযায়ী চালিত হয়েছে। যদিও দর্শক রুচিকে এড়িয়ে যাওয়া নাট্যকার এবং মঞ্চ পরিচালকের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। কারণ নাটক-মঞ্চ-দর্শক পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, আর এই সূত্রতাকে মান্যতা দিয়ে বাংলার মঞ্চ এগিয়ে গিয়েছে ভবিষ্যতের দিকে।

তথ্যসূত্র:

১। নিমাই পাল (সম্পা.), দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্ম জীবনচরিত, কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, সদেশ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮, পৃ. ১৬০।

২। মোহিত রায় (সম্পা.), ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, অমরভারতী, কলকাতা, পৃ. ৫২।

৩। গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা (১ম খন্ড), অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৫, পৃ. ১৭০।

৪। নিমাই পাল (সম্পা.), দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্ম জীবনচরিত, পৃ. ৯১।

৫। দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, আগস্ট ২০০৩, পৃ. ২৩।

Citation: **ভট্টাচার্য. টু.,** (2026) "রঙ্গমঞ্চ ও দর্শক : সম্পর্কের সমীকরণ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-04, April-2026.